সৌম্য দাশগুপ্ত

‘তোমার সুরে সুর মেলাবো বলে’: জারিগানের ভিতর দিয়ে বঙ্গদর্শন

মেরি ফ্রান্সিস ডানহ্যামের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার

জারিগান বিশেষজ্ঞ মেরি ফ্রান্সিস ডানহ্যাম

এ এক অন্য সময়ের গল্প, চেনাশোনা চরিত্রদেরও যে-সময়ের আলোয় অন্যরকম লাগে। অনেক চরিত্র চেনা নয় হয়তো, কিন্তু আমাদের দেশজ সেই মানুষগুলিকে পরম যত্নের সঙ্গে, মমতার সঙ্গে চিনিয়ে দেন সত্তরোর্ধ্বা এক মার্কিন পণ্ডিত, চিন আর ন্যুয়র্কের মধ্যে নিজের সময় ভাগ করে নিতে নিতে, নাম মেরি ফ্রান্সিস ডানহ্যাম। সাক্ষাৎকারটি তাঁর, কিন্তু এই লাজুক, মুখচোরা, বিনয়ী ভদ্রমহিলা কেবলই বলেছেন অন্যদের কথা। আত্মকথা যে আসলে মানুষের জীবনে অন্যের প্রভাব আর যোগাযোগের গল্প, সেটা শেখা যায় মেরির এই সাক্ষাৎকারটি পড়লে।

কোন্ ধরনের মানুষের সাহচর্যে এসেছেন মেরি? এই সাক্ষাৎকারে দেখা যাবে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন রবিশঙ্কর, জসীম উদ্‌দীন, সত্যজিৎ রায়, আব্বাসউদ্দিনের পুত্র আব্বাসী, অধ্যাপক শহীদুল্লাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক লুৎফর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যতত্ত্ববিভাগের অধ্যাপক জামিল আহমদ, প্রয়াত লেখক, ভাবুক ও কর্মবীর আহমদ ছফা, কলাম্বিয়ার স্পেনীয় লোকসংগীতের অধ্যাপক ইজ্রায়েল কাট্‌জ, সংস্কৃত ও পালি বিশেষজ্ঞ টেড রিকার্ডি, নৃসংগীতবিদ্যার নানা পণ্ডিত, প্রয়াত বাংলার অধ্যাপক এডওয়ার্ড ডিমক, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিদ র‍্যাল্ফও মার্টা নিকোলাস (দ্বিতীয়জনের চড়ক ও গাজন নিয়ে চমৎকার গবেষণা রয়েছে), এবং আরও অনেক কৃতী মানুষ।

কৃতী মানুষেরা বোধহয় সমকালীন কৃতী মানুষদের ঠিক খুঁজে বের করেন, এবং দুজন কৃতী মানুষ পারস্পরিক সংস্পর্শে এসে দিব্যজ্যোতির মতো প্রজ্বলিত হয়ে ওঠেন বোধহয়। মেরির জবানবন্দি থেকে বোঝা যাবে কীভাবে ওপরের গুণীজনেরা এইভাবে কাছাকাছি এসে জন্ম দিয়েছেন অনবদ্য সব সৃষ্টির, যার অন্বেষণে আমরা সবাই এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলাম।

মেরিকে আমি প্রথম দেখি ১৯৯৫ সালে, ওয়াশিংটন ডিসি-র জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে বেঙ্গল স্টাডিজ কনফারেন্সে। এর আগে *কবিসম্মেলন* পত্রিকায় (শারদীয় ২০০৬) ক্লিন্টন সীলির সাক্ষাৎকার লিখতে গিয়ে এই সম্মেলনের বর্ণনা করেছি। একটি অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে সেই ঘরে গিয়ে আসন নিয়েছি, দেখি একটা

সাংহাই চাইনায় মেয়ের বাড়িতে মেরি ফ্রান্সিস ডানহ্যাম, ২০০৬

ব্ল্যাকবোর্ডে তাঁর আসন্ন সেশনের বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন মেরি, মুক্তোর মতো বাংলা হাতের লেখায় বাংলা লোকসংগীতের শ্রেণিবিভাজন করছেন। সেখানে লেখা জারি, সারি,ভাটিয়ালি, আর অন্যান্য লোকসংগীতশাখার নাম, আর নানারকম রেখাচিত্রে তাদের একধরনের শ্রেণিবিভাজন করা চলছে।

এর পরে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, ১৯৯৯ সালে ডালাসে থাকাকালীন তাঁকে আমন্ত্রণ জানাই কয়েকজন সংস্কৃতিপ্রেমী স্বেচ্ছাব্রতীদের তৈরি করা একাডেমি অফ বাংলা আর্টস অ্যান্ড কালচার আয়োজিত 'আন্তর্জাতিক বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি' সম্মেলনে। মেরি আসতে পারেননি সেবার, তাঁর মেয়ের কাছে যেতে হয়েছিল চিন-এ, কিন্তু এর অব্যবহিত পরে, ২০০০ সালে শুধু তাঁকে নিয়েই একাডেমি থেকে একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করি আমরা, সেখানে তাঁর স্লাইড শো-এর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উৎসাহী কর্মীদের জারিগান আসর জমিয়ে তোলে। গানের দায়িত্বে ছিলেন আনিসুজ্জামান, মানিক আর অন্যান্য সহকর্মীরা।

এর পর তাঁর সঙ্গে মূলত ই-মেলে যোগাযোগ, তিনি আজ ন্যুয়র্কে তো কাল চিনে, সেখানে তাঁর মেয়ে ক্যাথরিন (তার জন্ম বাংলায়, এমনকি আমেরিকায় ফেরার পর স্কুলে পাঠানো হলে তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হত আশ্চর্য নোটিশ : 'আমি ইংরেজি বেশি বলি না, বাংলা বলি'!) বসবাস করেন, মেরি ঘনঘন সেখানে মাতামহীর দায়িত্ব পালন করতে চলে যান। আমেরিকায় ফিরলে ওঠেন তাঁদেরই সাহায্যে আমেরিকায় আসা পূর্ববঙ্গের একটি নিরক্ষর পরিবারের বাসায়, সেই রূপলাল দুরিয়ার গল্পও শোনা যাবে এই সাক্ষাৎকারে। যখনই এসেছেন, এই রূপলালের বাড়িতে আমরা ফোন করে মেরির সঙ্গে কথা বলেছি। এরই মধ্যে চলছে তাঁর নতুন কাজ, স্পেনীয় সংগীতের সংগ্রাহিকা তৈরি করতে ব্যস্ত এখন তিনি, পরম যত্নের সঙ্গে সেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে তৈরি করে দিয়েছেন আমাদের নানা কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তর।

এই লেখাটি তৈরি হওয়ার নানা সময়ে তাঁকে ম্যানুস্ক্রিপ্ট পাঠিয়েছি, মূল বাংলায় পুরোটা কীরকম দাঁড়াচ্ছে সে-বিষয়ে তাঁর মন্তব্য শোনার জন্য। বলাবাহুল্য, তথ্যভিত্তিক অংশগুলি নিয়ে কোনো আপত্তি করেননি মেরি, কারণ সেগুলি তাঁরই জোগানো, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে আমাদের বিশেষণগুলি নিয়ে ভয়ানক আপত্তি করেছেন। সেগুলি উপেক্ষা করা গেল।

২। মেরি ফ্রান্সিস ডানহ্যামের কর্মপরিচয়

মেরি ফ্রান্সেস্ ডানহ্যাম-এর জন্ম ১৯৩২ সালের ২৬ মার্চ। হার্ভার্ড থেকে ১৯৫৪ সালে রোম্যান্স ভাষা ও সাহিত্যে বি.এ. পাস করেন, তার পাঁচ বছর পর হার্ভার্ড থেকেই ক্লাসিকাল ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে এম. এ. করেন (১৯৫৯)। এর মধ্যে ১৯৫১ সালে ফ্রান্সের ফঁতেব্লো স্কুল অব মিউজিক থেকে মিউজিক কম্পোজিশন নিয়ে ডিপ্লোমা করেছেন, এবং যে-আগ্রহ থেকে এই সাক্ষাৎকারটির জন্যে তিনি পরে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবেন, সেই ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রশিক্ষণ পেয়ে সার্টিফিকেট পেয়েছেন বরিশালের স্কুল অব মিউজিক থেকে, সেটা ১৯৬৫ সাল। আমরা পরে দেখব, এর মধ্যে অনেকগুলি বছর তিনি কাটিয়েছেন তাঁর অধুনাপ্রয়াত স্থপতি স্বামী ড্যানিয়েল (সংক্ষেপে ড্যান) ডানহ্যামের সঙ্গে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে, বাংলাদেশের পত্তন দেখেছেন, এবং ১৯৭২ সালে দেশে ফিরে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফের এম.এ.করেছেন ভারতবিদ্যায়। পি. এইচ ডি করার ইচ্ছে ছিল তাঁর, কাজের গভীরতায় মুগ্ধ হয়ে অনেকে তাঁকে উৎসাহও দিয়েছিলেন এ-বিষয়ে। কিন্তু মেরি জানিয়েছেন যে তখন তাঁর কন্যার বড়ো হয়ে ওঠা এবং স্বামীর সঙ্গে নানা দেশে যাওয়া—এই দ্বৈরথে তিনি ওদিকে পা বাড়াননি, গবেষণার কাজ করেছেন হাতে যখন সময় পেয়েছেন তখন, আপন খেয়ালে, সারাজীবন ধরে, এর জন্য প্রথাসিদ্ধ ডক্টরেট করার দরকার বোধ করেননি।

মেরি ডানহ্যামের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হল তাঁর ১৯৯৭ সালে ঢাকার ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড থেকে প্রকাশিত ইংরেজি ভাষার বই *জারিগান : মুসলিম এপিক সংস অফ বাংলাদেশ*। ৩৭০ পাতার একটি অত্যন্ত তথ্যসমৃদ্ধ প্রামাণ্য গ্রন্থ, এতে মূল গানের টেক্সট, অনুবাদ, টিকা, নির্দেশিকা ও স্বরলিপি পাওয়া যায়, সঙ্গে একটি ক্যাসেট। কিন্তু আর যা যা পাওয়া যায়, তার মূল্য কম নয়। লেখিকার দীর্ঘ দিনের ঘোরাঘুরির অভিজ্ঞতায় বাংলাদেশের লোকসমাজের চিত্র যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনই একটি বিশেষ লোকসংস্কৃতিশাখার মানুষ ও তাঁর শিল্পচর্চার ইতিহাস, ধর্মীয় উপাদান, সাংস্কৃতিক আলোচনা, নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, মানবিক দর্শন, এইসব ছড়িয়ে রয়েছে এ বইয়ের ছত্রে ছত্রে। অথচ তথ্যের অভাবে কল্পনার আশ্রয় নেননি তিনি, গবেষক হিসেবে সে তাঁর কাজ নয়। তথ্যের মধ্যেই ফুটিয়ে তুলেছেন তত্ত্বের মাধুর্য।

এছাড়া অন্যান্য বিষয়ে তাঁর বেশ কিছু গবেষণা রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৯৯৬ সালে বেঙ্গল স্টাডিজ কনফারেন্সে পঠিত 'দ্য মিনিং অফ ধুয়া', অ্যাসোসিয়েশন ফর এশিয়ান স্টাডিজ, কনফারেন্সে ১৯৯৮ সালে পড়া পেপার 'কীভাবে ক্রন্দনসংগীত হয়ে ওঠে মনোরঞ্জনের উপাদান? বাংলার জারিগানের সংজ্ঞা নিরূপণের সমস্যা', এবং এ-বিষয়ে আরও বহু গবেষণা।

লিজ্‌ল (ই বি) বার্নেটের সঙ্গে ১৯৭৯ সালে রবিশঙ্করকে নিয়ে স্মরণীয় একই কাজ করেছিলেন মেরি। তাঁকে দিয়ে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত শেখানোর রীতি একটি পাশ্চাত্য সংগীতশাস্ত্রীয় ধারা মেনে রেকর্ডিং করিয়েছিলেন তাঁরা। সেই অভিজ্ঞতার কথা পাওয়া যাবে এই সাক্ষাৎকারে।

বার্নার্ড কলেজের নাট্যতত্ত্ববিভাগের অধ্যাপক পিটার চেলকোস্কির সঙ্গে বাংলাদেশের মহরম উৎসবের নাটকীয়তা নিয়ে মেরির 'সচিত্র বক্তৃতা' ২০০০ সালে বিশেষ জনপ্রিয় হয়। পারস্য ও আরবের ভুকন কীভাবে বাংলায় এল এই নিয়ে তাঁর অসামান্য বক্তৃতা ডালাসের একাডেমি অফ বাংলা আর্টস্ অ্যান্ড কালচারের সবার স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে। শুধু তাঁর নির্দিষ্ট বিষয় নয়, উত্তর ভারতের রাগসংগীত পদ্ধতি নিয়ে ন্যুয়র্কেও এশিয়া সোসাইটিতে বক্তৃতা করেছেন সেই ১৯৭৬ সালে, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ওইসময়েই বক্তৃতা করেছেন বাংলার সংগীত ও নৃত্যকলা সম্পর্কে।

ইংরেজি ও বাংলা ছাড়াও ৪টি ভাষা জানেন মেরি—ফরাসি, প্রাচীন গ্রিক, লাতিন ও সংস্কৃত। বহুভাষাবিদদের একটা মস্ত সৌভাগ্য হয়, সংস্কৃতির পাঁচিল টপকে নানা উঠোন দেখতে পাওয়ার। ব্যাবসাকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিকায়ন দেখা যায়, কিন্তু একটি ভাষার প্রাচীন রূপ জেনে বা তার পিতামহকে জেনে সেই সংস্কৃতির মূলে যাওয়ার চেষ্টা খুব বেশি দেখা যায় না। এ-বছরের প্রথমভাগে সুইডেন, জার্মানি, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে তিনবার করে যেতে হয়েছে আমাকে, সেখানে লক্ষ করেছি যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন তৈরি হওয়ার পর এইসব দেশে নানা সমাজের মানুষ এসে বসবাস করছেন, কিন্তু তাঁদের পারস্পরিক আদানপ্রদান ঘটেনি এখনও। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলার সাংস্কৃতিক দূরত্ব সহজেই অনুমেয়, গোটা ইউরোপ ভারতবর্ষের মধ্যেই দুবারের বেশি এঁটে যায়। সাংস্কৃতিক দূরত্বের কথাটা সাবধানে

লিখছি, একে কল সেন্টার বা বিপিও-র সংস্কৃতির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবেন না পাঠক!

কোন্ কোন্ দেশে থেকেছেন মেরি? বাংলাদেশে থেকেছেন জীবনের মোট কুড়ি বছর, ফ্রান্সে পাঁচ বছর, ইংল্যান্ডে এক বছর, আর ভারত-নেপাল-শ্রীলঙ্কা-মরিটানিয়া-চিনে কয়েক মাস করে। এত বৈচিত্র্যময় যাঁর জীবন ও কর্ম, তাঁর কথা তাঁর মুখেই শোনার সৌভাগ্য আমাদের হল এই বিশেষ ইলেকট্রনিক সাক্ষাৎকারে।

৩। সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন : আপনাকে যে ভদ্রমহিলা বড়ো করেছিলেন, তাঁর সম্পর্কে বলুন।

ডানহ্যাম : আমার যখন এগারো বছর বয়স আর ভাইয়ের চার, তখন আমাদের মা নিউমোনিয়ায় মারা যান। তখনও পেনিসিলিনের এত চল হয়নি, তাছাড়া ১৯৪৩-এর গ্রিক যুদ্ধের আর্তত্রাণ প্রকল্পে অসম্ভব পরিশ্রম করে তিনি কাহিল হয়ে পড়েছিলেন। মা মারা যাওয়ার পর আরেকটি পরিবার থেকে বিলিতি প্রশিক্ষণ পাওয়া একজন গভর্নেসকে আমরা পাই, যিনি আমাদের মায়ের বিকল্প এবং বাড়ির পরিচারিকা হিসেবে আমার ভাই কলেজে যাওয়া পর্যন্ত থেকে যান। সুতরাং, ন্যুইয়র্কে থাকা সত্ত্বেও আমরা বিলিতি আদবকায়দায় বড়ো হয়েছিলাম।

মেরি ফ্রান্সিস অলস মুহূর্তে পুনের একটি পার্কে বসন্ত ,২০০৪

মজার ব্যাপার হল 'এমি' (এই নামেই আমরা সেই গভর্নেস মেরি ফ্লোরেন্স এমার্সন-কে ডাকতাম) নিজে জন্মেছিলেন খোদ কলকাতা শহরে। তার বাবা রাজভবনের উলটোদিকে ফ্রান্সিস, হ্যারিসন, হ্যাথাওয়ে অ্যান্ড কোম্পানি নামে একটা দোকানে কাজ করতেন। পাঁচ ভাইবোনের সঙ্গে কীভাবে ছোটোবেলায় তাঁকে ইডেন গার্ডেনসে নিয়ে যাওয়া হত তা গল্প করতেন এমি। বহুবছর পর, আমি আর আমার স্বামী ড্যান যখন ঢাকায়, তখন এমি আমাদের কাছে বেড়াতে আসেন, আর আমি তাঁকে নিয়ে কলকাতা আর দার্জিলিঙে যাই। তিনি সেই বিখ্যাত দোকানটির দুর্দশা দেখে বিমর্ষ হয়ে পড়েন, সেটি তখন নানা ভাগে ভাগ হয়ে অন্য কাজে লাগানো হয়েছে, কিন্তু তখনও প্রবেশপথের মাথার ওপরের দেয়ালে খোদাই করা হ্যাথাওয়ে শব্দটা দেখা যাচ্ছে।

ধর্মতলা স্ট্রিটে গেলাম তাঁর ছোটোবেলার রবিবারের গির্জা দেখতে। সেটার গায়ে তখনও ফলকে লেখা তাঁর বাবার নাম, যদিও সেই গির্জা এখন একটা প্রাইভেট গার্লস্ স্কুলে রূপান্তরিত হয়েছে। এমির ভাইপো এখনও তার দাদুর নামে ওই স্কুলের একটি দুঃস্থ ছাত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

দার্জিলিঙে একটি করবরখানায় গেলাম, সেখানে এমি তাঁর ছোটোবেলার কয়েকজন সাথীর নাম দেখতে পেলেন কবরফলকের ওপর। তিনি সেখানে থাকাকালীনই বিশাল এক ধস নেমে তাঁদের মৃত্যু হয়েছিল। এমি নানা কথাপ্রসঙ্গে আমাদের জানালেন কীভাবে তখন কলকাতা থেকে দার্জিলিংগামী ট্রেন ঢাকা হয়ে যেত!

প্রশ্ন : বাংলার সংস্কৃতির ব্যাপারে আপনার উৎসাহ শুরু হল কখন?

ডানহ্যাম : ১৯৬০ সালের যে-মুহূর্তে আমার স্বামীর সঙ্গে ঢাকায় পদার্পণ করলাম। তখন তো আর জানতাম না যে ওই দফায় টানা সাতবছর থেকে যাব এবং ভবিষ্যতে নানা সময়ে দফায় দফায় এসে আবার থাকব!

প্রথমে স্থানীয় একটি ফার্মের সঙ্গে পার্টনারশিপে গিয়ে 'বার্জার ইঞ্জিনিয়ার্স' নামে একটি মার্কিনি ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম আমার স্বামীকে ঢাকায় নিয়ে আসেন একটি আর্কিটেকচার অফিস তৈরি করার জন্যে। তুলনামূলকভাবে একটি নূতন দেশ, তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে এটাই ছিল প্রথম প্রাইভেট আর্কিটেকচার ফার্ম। দেড় বছর বাদে টেক্সাস এ অ্যান্ড এম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একদল অধ্যাপক আমার স্বামীকে তৎকালীন ইপুয়েট (ইস্ট পাকিস্তান ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, বর্তমান বিখ্যাত 'বুয়েট', বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি)-এর প্রথম আর্কিটেকচারাল বিভাগ তৈরি করার দায়িত্ব দেয়। বিভাগটি প্রতিষ্ঠা করে সেখানে তিনি টানা ছ'বছর অধ্যাপনা করেন। এর মধ্যে তিনি নানা প্রকল্পের স্থপতির কাজ করেছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঢাকার কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ও বর্তমান বুয়েটের নানা সংযোজন। আমরা ১৯৬৭ সালে ফিরে যাওয়ার পর তিনি ইউ এন ডি পি-র সঙ্গে সাইক্লোন পুনর্বাসন প্রকল্পে বেশ কয়েকবার ঢাকায় এসেছেন, ১৯৭০-এর সেই কুখ্যাত সাইক্লোনের সময়ও। বাংলাদেশের CARE ও সেভ দ্য চিলড্রেন-এর নানা প্রকল্পে কাজ করেছেন। এছাড়াও ছোটোখাটো নানা কাজে তিনি যখনই এসেছেন আমি তাঁর সঙ্গে এসেছি। এমনকি ১৯৯৩-১৯৯৬—এই তিন বছর আমি যখন জারিগান বইটি লিখছি সেই কাজে তাঁর সঙ্গে এখানে এসেছি। মোট প্রায় ১৫ বছর নানা কারণে আমরা বাংলাদেশে থেকেছি, এবং এই সময়গুলিকে আমি আমার জীবনের অন্যতম সুখের সময় বলে মনে করি।

ঢাকায় থাকার জায়গা খুঁজে পাওয়ার আগে আমরা থাকতাম 'শাহবাগ' হোটেলে, তখনকার সবচেয়ে বিলাসবহুল হোটেল, সেখানে পরিচারক ঘর বয়ে বালতিভরা স্নানের জল পৌঁছে দিত। বাংলা ভাষা শেখার অদম্য আগ্রহে আমি একদিন একটা সাইকেল কিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রাস্তা খুঁজে বের করলাম। সোজা বিভাগীয় প্রধানের কাছে গিয়ে বললাম আমি একজন বাংলার শিক্ষক খুঁজছি। তিনি একজন তরুণ অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন।

তাঁর নাম আহমদ শরীফ, যিনি তখনই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিশ্রুতিমান অধ্যাপক হিসেবে নাম করেছেন।

বেশ কয়েক সপ্তাহ হোটেলে থাকাকালীন রুমবয়দের সাহায্যে বাংলা বর্ণমালা শিখে ফেললাম। সেইসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব বিভাগ ছিল না, কিন্তু ছোটোবেলায় ফ্রান্সে কিছুদিন থাকাকালীন ফরাসি শেখার অভিজ্ঞতা ছিল, পরবর্তীকালে স্কুলে কলেজে লাতিন ও প্রাচীন গ্রিক শিখেছি, তাই নিজেকেই নিজে ভাষা শেখানোর উপায় জানা ছিল, বিশেষ করে ভাষাটি যখন ইন্দো-ইউরোপীয়। কিন্তু শব্দগুলির ধ্বনি শোনার দরকার ছিল এবং সাহিত্য শেখার আগ্রহ ছিল খুব। এ-ব্যাপারে আহমদ শরীফ ছিলেন সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি। আমার শেখার পদ্ধতি নিয়ে তাঁর একেবারেই কোনো সমস্যা হয়নি। বিশেষ করে উপভোগ করেছিলাম তাঁর কণ্ঠে একটি বইয়ের পাঠ শুনে, যেখানে লেখক তাঁর সুইজারল্যান্ডের আলপ্‌স ভ্রমণের বিবরণ লিখতে দিয়ে দার্জিলিঙের একটি পর্বতশিখর থেকে এভারেস্ট দর্শনের তুলনা করেছেন। আহমদ শরীফই আমাকে রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এই অসামান্য ব্যক্তি কিছুদিন আগে মারা গেলেন, মৃত্যুর দিন পর্যন্ত আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

প্রশ্ন : ঢাকায় ওই প্রথম সাত বছর কীভাবে কাটিয়েছিলেন?

ডানহ্যাম : রমনা অঞ্চলে আমি ও আমার স্বামী ছোটো একটি বাসা খুঁজে পাওয়ার পর আমি বেশ কয়েকটি ছোটো প্রজেক্টে হাত দিই, তার মধ্যে অন্যতম ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসি পড়ানো, কলেজ অফ হোম ইকনমিকসে ইংরেজি পড়ানো, আর হোলি ক্রস স্কুলে সংগীত শেখানোর জন্যে, যাতে তাঁরা স্থানীয় রোগীদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে পারেন। তাঁরা ভোরবেলা একটা গাড়ি পাঠিয়ে দিতেন, আর আমি পৌঁছানোমাত্র একটি বাঙালি ছেলেকে ডেকে পাঠাতেন যার কাজ ছিল আমি যা পড়াব সেটা বাংলায় উচ্চারণ করে শোনানো। আমরা সবাই মিলে ধানমন্ডির দিকে যেতাম, সেখানে তখন নতুন বাসস্থান তৈরি হচ্ছে, সেই ডাক্তারদের দল আর বেশিরভাগ বিদেশিরা তখন সেখানেই থাকতেন।

মজার কথা হল যে ডাক্তাররা অচিরেই একটি একটি করে বাংলা বাক্য তৈরি করতে শেখার থেকে রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারে বেশি উৎসাহী হয়ে উঠলেন। এর ফলে আমাদের ভোরবেলাগুলি খুব অফ-বিট আনন্দে কাটতে লাগল, রাবীন্দ্রিক পাঠে, আলোচনায়। পরে কলেরা রোগীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারপর্বে আমি ডাক্তারদের সাহায্য করেছিলাম। ওইসময়ে গবেষণা করে তাঁরা যা বের করেছিলেন তা সারা পৃথিবীর উপকারে এসেছিল।

এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসি শিক্ষক মঁসিয়ে রুচকে আমি ইস্ট পাকিস্তানের প্রথম আলিয়াঁস ফ্রঁসেজ তৈরি করার ব্যাপারে সহায়তা করি, প্রথমে ঢাকায় তারপর চট্টগ্রামে। প্রাথমিক ফরাসি পড়ানো ছাড়াও তখন এক বন্ধুর সঙ্গে পাশ্চাত্য সংগীত নিয়ে যৌথ ক্লাস নিতাম আমরা। আমি যখন একটা বিশেষ সময়ের সংগীত পিয়ানোয় বাজাচ্ছি কিংবা রেকর্ডিংয়ে শোনাচ্ছি, তখন বন্ধুটি সেইসময়কার চিত্রকলা স্লাইড শোয়ে দেখাত। আমরা এইরকম অ্যামেচার লেকচার দেওয়ার সাহস পেতাম কারণ বাঙালিরা সে-যুগে জানবার অদম্য আগ্রহে হাতের কাছে যা পেত তাই যত্ন করে শিখতে চাইত।

আহমদ শরীফকে যখন আমার সংগীতস্পৃহার কথা জানাই, তিনি পরামর্শ দিলেন 'বাফা'য় যোগাযোগ করতে, বুলবুল একাডেমি অফ ফাইন আর্টস্-এ। শরীফ সাহেবের এক আত্মীয় পুরোনো ঢাকার গভীর অভ্যন্তরে অবস্থিত বাফা কার্যালয়ের পরিচালক ছিলেন, তাঁর নাম নুরুল হুদা। এই হুদা ভাই খুব চমৎকার মানুষ, ব্রিটিশ আমলে স্বাধীনতাসংগ্রামী বিপ্লবীদলে যোগ দিয়েছিলেন বলে, পুলিশের হাতে ধরা পড়ে জেলে গিয়েছিলেন বলে বেশ গর্ববোধ করতেন। বেশ কয়েকবার যাতায়াত করার পর হুদা সাহেব আমাকে ও আরও দুজন বিদেশিনী মহিলাকে প্রবেশিকা নাচের ক্লাসে ঢোকার অনুমতি দিলেন। রবিবার ভোর-ভোর মাদাম রুচ আর ফরাসি দূতাবাসের অ্যাটাশের স্ত্রী সুনান্তার সঙ্গে সাইকেলে করে আমি পুরোনো ঢাকার একটি জমকালো ভিক্টোরিয়ান ম্যানশনে গিয়ে পৌঁছতাম। ওই ম্যানশনের ভেতরে ছিল শিল্পকলা ও সংগীতের এই স্কুলটি।

তরঙ্গিনী হরিণীদের মাঝে ছন্দোহীনা হস্তিনীর মতো আমরা তিন মহিলা পা ঠুকে ঠুকে নৃত্যগুরুর ভঙ্গিমা নকল করার চেষ্টা করতাম। ছোটোদের ক্লাসে শেষ সারিতে দাঁড়িয়ে ভরতনাট্যম আর মণিপুরীর মুদ্রা শেখার চেষ্টা করতাম। কয়েকবছর পর, ১৯৬২ নাগাদ, এক মার্কিন দম্পতি আমাদের কলকাতায় একটি সংগীত সম্মেলনের টিকিট দিলেন। এই সম্মেলনটি সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই ছিল না, কিন্তু খুব আগ্রহের সঙ্গেই গেলাম। এই রাত্রিদিনব্যাপী সংগীত সম্মেলনটি আমাদের দুই বাংলার প্রবাসী জীবনে এবং নিউইয়র্কে ফিরে আসার পরের কর্মজীবনেও গভীর ও স্থায়ী দাগ কেটেছিল।

১৯৬৬ সালের শীতকালে আমি বরিশালে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত শিক্ষালয়ের একটি ছ-সপ্তাহের সেশনে যোগ দিই। একজন কানাডিয়ান 'নান' এটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, নাম রিটা ব্যূচার, তিনি নিজে চমৎকার সেতার বাজাতেন এবং খেয়াল গাইতেন, দিল্লি থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছিলেন। আমি এরপর এখানে এক বছর কণ্ঠসংগীতের ক্লাস করি এবং খানিকটা তবলা বাজানোও শিখি। ছেলেবেলায় পিয়ানো শিখেছিলাম, তাছাড়া ১৯৫১ সালের গ্রীষ্মে ফঁতেব্লো স্কুল অফ মিউজিকে কোর্স করেছিলাম, তাই নতুন সংগীত শেখার মূল পদ্ধতিটি জানা ছিল, তবু টের পেলাম যে ভারতীয় সংগীতের একেবারে গোড়ার দিকের ব্যাপারগুলি শেখার জন্যেও আমার বয়সটা একটু বেশি হয়ে গেছে! যেটা শিখলাম অবশ্য, তা হল সংগীতের তত্ত্ব, যা পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান কবি জসীম উদ্‌দীনের কাজের সংগীতিক প্রতিস্বরীকরণের সময়ে খুব কাজে এসেছিল।

বাফায় যাতায়াতের সময়ে নুরুল হুদা সাহেবের ভাতিজি সেলিনা বাহারের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়। তিনি স্কুলটি চালানোর ব্যাপারে অ্যাসিস্টান্ট হিসেবে অসম্ভব পরিশ্রম করতেন। তার পিতা হবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী ছিলেন কলকাতার প্রখ্যাত কবি, প্রাবন্ধিক ও স্বাধীনতাসংগ্রামী। উত্তরাধিকারসূত্রে সেলিনা তাঁর পিতার কাছে সাহিত্যানুরাগ ও প্রতিবাদী চরিত্র পেয়েছিলেন, নারীর অধিকার নিয়ে তাঁর নেতৃত্ব উল্লেখযোগ্য। তিনি পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কের অধ্যাপিকা হন। তাঁর মা-ও ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিকল্পে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁর দুই বোন এবং এক ভাই আমাদের কাছাকাছি রমনার শান্তিবাগ অঞ্চলে থাকতেন। আমি আমার ছোট্ট মেয়েকে আঁচলে বেঁধে তাঁদের বাসায় কতবার বেড়াতে গিয়েছি। ঘটনাক্রমে সেলিনার এক বোন 'ডলি' (শাহীন বাহার চৌধুরী) আমার স্বামীর তৈরি করা স্থাপত্যকলা বিভাগে প্রথম তিনজন ছাত্রীর একজন হয়েছিলেন। কয়েকবছর আগে

ইংল্যান্ডের রানি তাঁকে সমাজসংস্কারক হিসেবে একটি বিশেষ পুরস্কার দেন। সেলিনার ভাই ইকবাল ওয়াশিংটন ডি. সি-তে ভয়েস অফ আমেরিকায় কাজ করেন। সেলিন নিজে ছোটোদের জন্য প্রচুর লিখেছেন। বছরদুয়েক আগে ঢাকায় হঠাৎ করে তিনি মারা যান।

দুজন মহিলার সঙ্গে আমি ঢাকার প্রথম ইংরেজি ভাষার গাইড বুক লিখি। তখন বানান ছিল 'ডাক্কা', বইয়ের নাম *লিভিং ইন ডাক্কা*। বেশ জটিল কাজ ছিল সেটা, কারণ তখন ঢাকা শহর প্রতিদিন বদলে যাচ্ছে। নতুন বিল্ডিং, নতুন সংস্থা, নতুন সাংস্কৃতিক কর্মধারা তখন প্রতিদিন গড়ে উঠছে, তাদের গতির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া দুঃসাধ্য ছিল। আমরা সেই ছয়ের দশকে বইটা লেখার পর তার তিনটে সংস্করণ হয়েছে।

কিন্তু যে প্রোজেক্টটি আমার জীবনে সবচেয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করে, সেটি এল একটা বিশেষ সময়ে, কবি জসীম উদ্‌দীনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর।

প্রশ্ন : কীভাবে এই ঘটনা আপনার জীবনে এত গুরুত্বপূর্ণ?

ডানহ্যাম : আমি অবাক, আশ্চর্য, এবং লজ্জিত বোধ করছি লক্ষ করে যে আমি কী করে পূর্ব পাকিস্তানের এই প্রধান কবির সাক্ষাতের কথাটা আমার 'জারিগান' বইয়ে বর্ণনা করতে ভুলে গেলাম। ছয়ের দশকে যখন বিশ্বজুড়ে নৃতত্ত্বসংগীতবিদ্যার চর্চা গড়ে উঠছে, তখন জসীম উদ্‌দীনই ছিলেন আমার এই বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে ওঠার ব্যাপারে প্রধান প্রেরণাদাতা।

১৯৬২ কি ৬৩ সালের এক সকালবেলা জসীম উদ্‌দীনই আমাদের সিদ্ধেশ্বরী রোডের বাড়িতে এসে হাজির হলেন। আমি তাঁর কথা অনেক শুনেছিলাম, কিন্তু সামনাসামনি দেখতে পাব ভাবিনি। তিনি জানালেন যে তিনি কিছু জারিগান রেকর্ড করতে চান, যেগুলি পাশ্চাত্যপ্রথায় স্বরলিপি করা দরকার, তাই এমন কাউকে খুঁজছেন যিনি তাঁকে সাহায্য করতে পারবেন। তখনও একটি নতুন সংস্কৃতির সংগীতের স্বরলিপি করার ব্যাপারে আমার দক্ষতা নিয়ে আমার নিজের বেশ সংশয় ছিল।

এতে একেবারেই দমে না গিয়ে জসীম উদ্‌দীন জিজ্ঞেস করলেন যে ফরিদপুর থেকে একজন নামকরা গায়ককে নিয়ে এসে আমি তাঁর গান রেকর্ড করতে রাজি কিনা। আমাদের একজন মার্কিনি বন্ধুর কাছে সে-যুগে একটা মস্ত স্পুল রেকর্ডার মেশিন ছিল—আজকের যুগের রেকর্ডারের তুলনায় সেটা খুব ভারী। সে-ই মেশিনটি ধার দিতে রাজি হলেন। সেই ফরিদপুরের ব্যক্তিকে নিয়ে বহু রেকর্ডিং সেশনের পর আমাদের সংগ্রহে এল দু-ডজন জারিগান, যার থেকে ১২টি বেছে জসীম উদ্‌দীন আমাকে স্বরলিপি করতে দিলেন।

প্রথমে তিনি তাঁর স্ত্রীকে দিয়ে গানের স্তবকগুলি ইংরেজি লিপিতে লিখিয়ে নিয়েছিলেন। কয়েকটা করে গানের বাণী নিয়ে আসতেন আর স্বরলিপি করতে দিতেন। গানগুলির চলন আর ছন্দ আমার কাছে একেবারে নতুন, তাই খুব আস্তে আস্তে কাজ করতে হত। আমার কাছে একটা স্পিনেট-হার্পিসকর্ড ছিল। ঢাকার আবহাওয়ার আর্দ্রতার ঘনঘন পরিবর্তনে যাতে নষ্ট না হয়ে যায়, সেজন্য আমার স্বামী ড্যান সেটা জার্মানি থেকে স্পেশাল অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়ে আনিয়েছিলেন। (কয়েক বছর পর কলকাতায় সত্যজিৎ রায়ের ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখি তাঁর কাছেও হুবহু একই মডেলটি রয়েছে)। এই ছোট্ট যন্ত্রটি আমি নিজেই সুরে বাঁধতে পারতাম, আলাদা করে আর টিউনার খোঁজার দরকার হত না, পিয়ানো বাঁধার সময়ে যেটা না হলে চলত না।

প্রায়ই জসীম উদ্‌দীনের কাছে অনুযোগ করতাম যে কাজটা খুব কঠিন লাগছে, ঠিকমতো পারছি কিনা জানি না। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে এই কাজটার জন্যে একদিন তুমি আমার কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করবে। অনেকদিন পর, ১৯৭২ সাল নাগাদ তাঁর কাছে মনে মনে ধন্যবাদ জানানোর মুহূর্তটি এসেছিল। আমাকে তিনি জারিগানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন বলেই কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ ক্লাসে থিসিস লেখার সময় আমি এই অভূতপূর্ব ও ব্যতিক্রমী বিষয়টিকে বেছে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। পরবর্তীকালে, ১৯৯৩-১৯৯৬ সালে চার বছরের জন্য এই বিষয়ের উপরেই জারিগান বইটি লেখার জন্য ঢাকার ফোর্ড ফাউন্ডেশন থেকে আমাকে বাংলাদেশে গিয়ে বসবাস করে গবেষণা করার অনুদান দেওয়া হয়।

স্বরলিপির ওপর কাজ করার সময় ঘনঘন জসীম উদ্‌দীনের বাসা 'পলাশবাড়ি'-তে তাঁর পরিবারের সকলের সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। সেটা তখন ছিল ঢাকার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটা খামার। তাঁর স্ত্রী বাড়ির গোরুর দুধে তৈরি দই এনে দিতেন। আস্তে আস্তে তাঁর ওই বাড়ি ঘিরে কতগুলি অদ্ভুত বাড়িওয়ালা পাড়া গড়ে ওঠে, আর রাস্তাটার নাম দেওয়া হয় জসীম উদ্‌দীন স্ট্রিট। এই জেলার নাম কমলাপুর, এখানে এখন আমার স্বামীর নকশায় তৈরি রেলওয়ে স্টেশনটি অবস্থিত।

১৯৬৮ সালে জসীম উদ্‌দীনের *জারিগান* বইটি প্রকাশিত হয়। অল্পবয়সে কলকাতায় ছাত্রাবস্থায় স্বয়ং দীনেশচন্দ্র সেনের মতো লোকসংগীত-সংগ্রাহক ও পণ্ডিতের সঙ্গে কাজ করেছিলেন জসীম উদ্‌দীন, তবু কোনোদিন নিজেকে পণ্ডিত হিসেবে স্বীকার করতেন না। তাঁর বইটি আসলে সত্যিই জারিগানের ঐতিহ্যের মূলভাবনার দরদী চিত্রায়ণ, ইতিহাসের তথ্যপঞ্জি আর সাংগীতিক কাঠামোর বিশ্লেষণ নয়। সে- ধরনের রেফারেন্সের জন্য আমাদের অধ্যাপক এস. এম.লুৎফর রহমানের ১৯৮৬-র বইটি দেখা উচিত।

সাংহাই উদ্যানে ভ্রমনরত, ২০০৬

প্রশ্ন : জামিল আহমেদের কাজ নিয়ে আপনার নানা লেখায় অনেক উল্লেখ দেখেছি। তাঁর বিষয়ে কিছু বলবেন?

ডানহ্যাম : নয়ের দশকে আমাদের মেয়ে ক্যাথরিনের ফুলব্রাইট স্কলারশিপের বছরে আমরা সিদ্ধেশ্বরী রোডের একটা ফ্ল্যাটে থাকতাম। তখন জানতে পারলাম যে আমাদের বাড়িওয়ালার মেয়ে এবং তার স্বামী আমাদের বাড়ির কাছেই একটি থিয়েটারে মাসিক 'বিষাদ সিন্ধু' নাটকে অভিনয় করেন। এই নাটকটি মীর মোশাররফ হোসেনের ইতিহাস ও মিথ

স্বাধীনতার আগে ঢাকার একটি রাস্তা
মেরি ফ্রান্সিস-এর আঁকা

আশ্রয়ী বই *বিষাদ সিন্ধু* উপন্যাস অবলম্বনে রচিত। সেখানে শিয়া সন্তদের শহিদ হওয়ার গল্প, বিশেষ করে মহম্মদ (সাঃ)-এর নাতি হাসান ও হোসেনের ভবিতব্যের কথা বলা হয়েছে। এই প্রোডাকশনটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর জামিল আহমেদের, যাঁকে আমার মনে হয়েছে অত্যন্ত উঁচু মানের নাট্যকার ও নির্দেশক।

তিনি পারস্যের তাজিয়া অভিনয়ের সঙ্গে বাংলার যাত্রাধারার এক অদ্ভুত সম্মিলন ঘটিয়েছিলেন, যার ফাঁকে ফাঁকে মিশে রয়েছে প্রাচীন গ্রিক ট্রাজেডির সঙ্গে আধুনিক ইউরোপীয় অভিনয় পদ্ধতির নির্যাস। দুটি সন্ধ্যা ধরে চলত এই অভিনয়; দৃশ্যসৌন্দর্য ও বাচনসৌন্দর্যের জন্য এই অভিনয় এত শক্তিশালী ছিল যে আমি বেশ কয়েকটি শো দেখেছি, যতদিন না পর্যন্ত আমি এই দলের সৌভাগ্যপ্রতীক বলে পরিগণিত হলাম। আমার মনে হয় জারিগানের যে মূল প্রেরণা ও ঐতিহ্য, সেটা সবচেয়ে ভালোভাবে ধরা পড়েছিল এই প্রোডাকশানে—বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য ও স্থানীয় বাঙালি গ্রামজীবনের প্রকৃত মেলবন্ধনে। ৩-৪ বছর ধরে নাটকটির অভিনয় চলে, মাসে দুদিন করে, যদিও এর থিম কিছুটা বিতর্কিত ছিল।

এখানে বলা দরকার যে ওইসময়ে ঢাকায় আরও কয়েকটি অসামান্য কাজ চলছিল। পরিবেশ থিয়েটারে অভূতপূর্ব সৃষ্টিশীলতা দেখিয়ে ঢাকার নির্দেশকরা তখন একটা পর আরেকটা কাজ তৈরি করে আমাদের মুগ্ধ করছেন। বাংলায় মলিয়ের নিয়ে কাজ চলছে তখন, একইসঙ্গে প্রাচীন, লোকায়ত ও আধুনিক ফর্ম নিয়েও।

প্রশ্ন : আপনি তো কিছুটা সময় পশ্চিমবাংলায়ও কাটিয়েছেন। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতার নিরিখে সেই অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলবেন?

ড্যানহ্যাম : পূর্ববঙ্গে অনেক বেশি সময় কাটিয়েছি বলে তার প্রতি আমার দুর্বলতা বেশি, তবু কলকাতাতেও গেছি নানা সময়ে। দুই বাংলার মধ্যে আমি মিল-অমিল দুটোই দেখতে পাই। প্রধানত অমিলগুলি ভাষাগত এবং ধর্মীয় আচারগত, এবং এর ফলে শিল্পের প্রকাশও দুই বাংলায় দুটি ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে।

ছয়ের দশকে পূর্ববাংলায় রবীন্দ্রনাথের গান ও গীতিনাট্যের কদর ছিল, কিন্তু তার পাশাপাশি ইকবালও ছিলেন পূর্ববাংলার মানসে। সম্ভবত পূর্ববঙ্গ পিউরিটান হয়েও নিজস্ব একটি ধারায় সৃজনশীল, বিশেষ করে নাটক ও চিত্রকলায়। আমার তো বাংলাদেশের থিয়েটার আর ভিজ্যুয়াল আর্ট কলকাতার চেয়েও মৌলিক মনে হয়েছে।

১৯৬৮ থেকে ১৯৭০পর্যন্ত আমার স্বামী ড্যান কলকাতা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং অর্গানাইজেশনে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের হয়ে বস্তি উন্নয়ন নিয়ে কাজ করতে যান। ওইসময়েই প্রথম দুর্গাপুজো দেখি। কলকাতায় আমি আমার নৃতত্ত্ববিদ বন্ধু মার্টা নিকোল্স্-এর সঙ্গে মহরমের উৎসবও দেখি। প্রচুর রেকর্ডিং করি, ছবি তুলি। এগুলি পরে আমার জারিগান বই লেখার সময়ে অনেক কাজে লেগেছে।

আগেই বলেছি যে আমার পালিকা মহিলার সঙ্গে কলকাতায় ও দার্জিলিঙে গিয়েছিলাম।

সেটা ছিল নকশাল আন্দোলনের সময়। ড্যানের অফিসের সমকর্মী অধ্যাপক ভূপেন মুখোপাধ্যায় ঘেরাও হলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। ভালো সেতার বাজাতেন।

কলকাতায় সেতার আর তবলার কিছুটা চর্চা চলতে থাকলেও আমার চার বছরের মেয়ে ক্যাথরিনকে নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকতে হত তখন। এইসময়ে ক্যাথরিনের জন্মদিনে তাকে তার জীবনের প্রথম পুতুলনাচ দেখানো হয়! এলগিন রোডের ছোটো একটা ফ্ল্যাটে থাকতাম, আর ক্যাথরিনকে লি রোডে মিস্ বার্থের স্কুলে নিয়ে যেতাম। সেখানে এখন একটা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল হয়েছে। সেই স্কুলেও কয়েকজন বন্ধু পেলাম আমরা। ক্যাথরিনের শিক্ষিকা এবং তাঁর স্বামীও বেশ বন্ধু হয়ে উঠলেন। তিনি অভিনেত্রী ও নির্দেশক ছিলেন, নানা শো করতেন কলকাতায়।

ফিলিস বোসের মেয়ে জ্যাকেলিন আর আমার মেয়ে একসঙ্গে পার্ক স্ট্রিটে শ্রীমতী মজুমদারের কাছে নাচ শিখতে যেত। জ্যাকেলিন পরে অভিনেত্রী ও চলচ্চিত্রকার হয়েছিল। ফিলিস নিজেও 'এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া' ছবিতে কয়েক মুহূর্তের জন্য অভিনয় করেছেন।

এরই মধ্যে মাদার টেরেসার একটি স্কুলবাড়ির ডিজাইন করল ড্যান।

ট্যাক্সিতে ময়দান দিয়ে যাওয়ার সময় ড্যানের গায়ে চা ছোঁড়ে নকশালরা। তারা ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অফিসেও হামলা করেছিল, কিন্তু আগুন লাগাতে পারেনি শেষ পর্যন্ত, কারণ ওরা নিজেরাই কেরোসিনে ভিজে গিয়েছিল।

কলকাতায় বাদল সরকারের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। তাঁর 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের প্রথম শো দেখি আমরা। আরেক বন্ধু ছিলেন ডক্টর রুস্তম ভরুচা, যিনি সুবিখ্যাত ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে থিয়েটার নিয়ে পিএইচ ডি করেছিলেন। থিয়েটার নিয়ে তাঁর বহু বই ও পেপার। বছরের পর বছর রুস্তমের সঙ্গে আড্ডা হয়েছে আমাদের, থিয়েটার বিষয়ে।

সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে দেখা হয় একবার, যদিও তিনি আজ বেঁচে থাকলে তাঁর ওই তীক্ষ্ণ নজর ও প্রবাদতুল্য প্রখর স্মৃতিশক্তি সত্ত্বেও আমাকে হয়তো মনে করতে পারতেন না। আমার ঠিক মনে পড়ছে না আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েই গেছিলাম, নাকি হঠাৎ একদিন খবর না দিয়েই তাঁর দরজায় গিয়ে কড়া নেড়েছিলাম। তাঁর

স্বামী দানিয়েল দুনহ্যমের আঁকা কলকাতার লি রোডের একটি বাড়ি, ১৯৭০

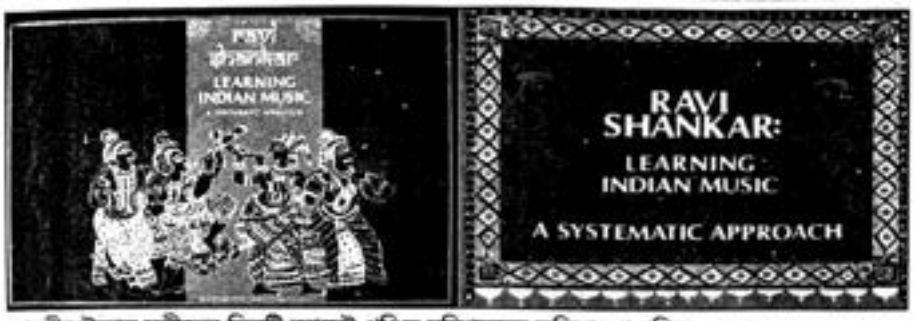

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তিনটি ক্যাসেট পণ্ডিত রবিশঙ্করের ভূমিকায় প্রকাশিত, ১৯৭৯

অ্যাপার্টমেন্টের কাছেই লি রোডে এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম আড্ডা দিতে। সেই আমেরিকান বন্ধুরা পিটার শুমানের 'ব্রেড অ্যান্ড পাপেট্স থিয়েটার'-এর সদস্য ছিল। তারা তখন জগদ্বিখ্যাত, ইউরোপে ও মেক্সিকোয় শো করেছে প্রচুর। তাদের ভারতে একটা ট্যুর করার ইচ্ছে ছিল প্রোডাকশন নিয়ে। ছয়ের দশকের গোড়ায় এরা কাজ শুরু করে এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধের ব্যাপারে আমেরিকার বিরুদ্ধে পথনাটিকা করে জনমত তৈরি করে। পুতুলগুলিও ছিল চমৎকার। একটা বিশেষ স্টাইল ছিল ওদের। কলকাতায় কোথায় এদের শো করা যায় এ-বিষয়ে পরামর্শ চাইতে গিয়েছিলাম সত্যজিতের কাছে। সঙ্গে প্রচুর ছবিটবিও নিয়ে গেছিলাম। কিন্তু তিনি এ-ব্যাপারে কোনোরকম সাহায্য করতে পারলেন না, তাই বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে এলাম। তখনই তাঁর বাড়িতে সেই বিরল জার্মান স্পিনেট-হার্পিস্কর্ডটি লক্ষ করি, যেটা আমারও আছে। মানুষটি বিরাট মাপের, সুদর্শন, প্রখর বুদ্ধিমেশানো তাঁর সৌন্দর্য। বিখ্যাত শিল্পী মানুষটিকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল বলে নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করি। তাঁর পাড়ার বাড়িগুলো যেন উনিশ শতাব্দীর, গা ছমছম করা।

১৯৭১-এর বসন্তে যখন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়, তখন আমি আর ড্যান ওয়াশিংটন ডিসিতে নিক্সনের কাছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লবি করি, এবং যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটরদেরকে পূর্ব-পাকিস্তানের হাল-হকিকত সম্পর্কে অবহিত করি। বঙ্গবন্ধু মুজিবের সেই বিখ্যাত জনসমাবেশের সময় ড্যান ঢাকায় ছিল। তার ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয় ইউ এন ডি পি-র নারী ও শিশুদের বাংলাদেশের বাইরে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার। এর মধ্যে শ্রীমতী নিক্সন একটি চমৎকার ব্যক্তিগত চিঠি দিয়ে আমাকে জানান যে আমাদের লবিং সফল হয়েছে, পাকিস্তানে মার্কিনি সহায়তা বন্ধ করা হল।

সেইসময়ে ড্যানকে ফের কলকাতায় পাঠাল ইউ এন ডি পি (নাকি ইউনিসেফ বা ফোর্ড ফাউন্ডেশন, ঠিক মনে পড়ছে না), পূর্ব বাংলা থেকে আসা শরণার্থীদের পুনর্বাসন প্রকল্পে সাহায্য করার জন্য। তখন পশ্চিমবাংলার শরণার্থী শিবিরগুলির দুর্দশার অন্ত ছিল না। ড্যান সেখানকার বর্জ্যনিষ্কাশনপ্রণালী ডিজাইন করেছিল। তাতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের থেকে খানিকটা রেহাই মেলে।

প্রশ্ন : ১৯৭২-১৯৯৩ এই সময়টা তাহলে আপনি ন্যুইয়র্কে নানা কাজে কাটিয়েছেন? কী কী কাজ করেছেন সেসময়ে?

ডানহ্যাম : ফিরে এসে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলাম। তখন আইনস্লি এমব্রি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ যুগ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পড়াতেন। আমাদের লেখা সেই *লিভিং ইন ঢাকা* বইটা পড়ে তিনি খুব খুশি হলেন। আমাকে তিনি নীরদ চৌধুরীর লেখার সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিলেন। ওই কোর্সে তিনি বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবন ও কর্মের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

অধ্যাপক বারবারা স্টোলার-মিলারের সঙ্গে আলাপ আর বন্ধুত্ব হল, সংস্কৃতের পণ্ডিত আর অনুবাদক তিনি। আমরা দুজনে একসঙ্গে বাংলা ক্লাস করতাম, বাংলার পিএইচ ডি-র এক ক্যান্ডিডেট আমাদের রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়বার সময় উচ্চারণ সংশোধন করে দিতেন। চারটে সেমেস্টার (দু-বছর) ধরে ধাপে ধাপে সংস্কৃত শিখলাম, যা বাংলা শেখার ব্যাপারে ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে ভীষণ সাহায্য করেছিল।

এরপর আমেরিকায় বেঙ্গল স্টাডিজ কনফারেন্স শুরু হয় এবং ড্যান আর আমি দুজনেই সেখানে নিয়মিত পেপার দিতাম।

সমাপতনিকভাবে ১৯৯২-১৯৯৩ সালে আমাদের মেয়ে ক্যাথরিন ফুলব্রাইট স্কলারশিপ পায় এবং ঢাকায় যায় গার্মেন্ট ফ্যাক্টরির মেয়েদের বসবাস-ব্যবস্থার ওপর গবেষণা করার জন্যে। আমি তার সাক্ষাৎকারগুলি অনুবাদ করার ব্যাপারে সাহায্য করি। '৯৩ সালের শেষে ক্যাথরিনের সহকারী মোখলেসুর রহমান লেনিন আমাকে পরামর্শ দেন জারিগান নিয়ে একটি বই লেখার প্রকল্পে নানা এন জি ও-তে আবেদন করার জন্য। শেষে ফোর্ড ফাউন্ডেশন রাজি হয়, এবং আমাদের প্রাথমিক কথাবার্তা শুরু হয়। এক বছর ফের ইয়র্কের নানা লাইব্রেরি ঘুরে হোমওয়ার্ক করার পর ফের ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশে যাই জারিগানের গবেষণার ফিল্ড ওয়ার্ক করার জন্য।

প্রশ্ন : রবিশঙ্করের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতার কথা বলুন।

ডানহ্যাম : এই প্রসঙ্গে আগে আমার বন্ধু প্রয়াত অধ্যাপক লিজল্ বার্নেটের কথা বলতে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে লিজল্ বার্নেট (তখন ছিলেন ব্রাউন) তাঁর স্বামী আর ছোটো মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় আশ্রয় নিতে যান। সেখানে তিনি ছিলেন অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর স্টাফ পিয়ানোবাদক, এবং মন্তেসরি স্কুলের শিক্ষিকা। তাঁর মেয়ে একটি বিলিতি স্কুলে পড়তে যেত, যেখানে অনেকদিন পর ঘটনাচক্রে আমার মেয়েও ভরতি হয়।

কলকাতায় থাকাকালীন লিজলের রবিশংকরের সঙ্গে আলাপ ও বন্ধুত্ব হয়। বহুবছর পর ন্যুইয়র্কে ফিরে আসার পর লিজল যখন সিটি কলেজে পড়াচ্ছেন, তখন তিনি রবিজিকে অনুরোধ করেন তাঁর ক্লাসে এসে কিছু বক্তৃতা করার জন্যে। রবিজি রাজি হয়েছিলেন এবং ছয় সপ্তাহ ধরে সপ্তাহে একটা করে ক্লাসে লেকচার-ডেমোনস্ট্রেশন

বাংলাদেশ ও ঐতিহ্যময় জারিগান বিষয়ক বই-এর প্রচ্ছদ

দিয়েছিলেন। সেগুলি লিজল্ রেকর্ড করেছিল। পরে আমি যখন লিজল্‌কে সোসাইটি ফর এথনোমিউজিকোলজির প্রকল্পে ভারতীয় সংগীতের একটি ডিস্কোগ্রাফি তৈরি করার কাজে সাহায্য করছি, তখন সে আমাকে সেগুলি শোনায়।

আমরা ভাবতে বসলাম এই টেপগুলি সংরক্ষণ করা যায় কী করে। তখন মাথায় একটা আইডিয়া এল যে রবিশঙ্করকে আবার আমন্ত্রণ জানিয়ে নতুন করে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে এই লেকচারগুলি রেকর্ড করার জন্যে বলে দেখলে হয়। এর সঙ্গে একটা সহকারী বইও তৈরি করা হবে, তাতে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের মূল কথাগুলি লেখা থাকবে। রবিজি রাজি হলেন, আর বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে তাঁর গ্রেসি স্কোয়ার ম্যানশনের হোটেলের ঘরে তিনি রেকর্ডিং-এর জন্য ফের পুরো বিষয়টি নিয়ে বক্তৃতা ও বাজনার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর বাছাই করা ছাত্ররা ছিল সেখানে। রবিজির সহকারী স্যু জোনস্ আগের থেকে ক্লাসের ব্যবস্থা করলেন, আমি আর লিজল্ তার সিলেবাসের একটা খসড়া করে দিয়েছিলাম, রবিজি সেটিকে আরও ঘষেমেজে তাঁর সিলেবাস তৈরি করলেন।

খুব উত্তেজনাকর ছিল দিনগুলো, কারণ আমরা ওই ক-টা দিন রবিশঙ্করের সঙ্গে খুব কাছে থেকে কাজ করেছিলাম, আর তাঁর সদা প্রাণোচ্ছল জীবনীশক্তি আর তাঁর 'ছাত্রদের' (ছাত্ররা অনেকে অবশ্য পেশাদারি সংগীতশিল্পী ছিলেন!) সঙ্গে আলাপ আলোচনা উপভোগ করেছিলাম। যদিও একেবারেই ঘটনাচক্রে লিজলের মাধ্যমে আমার সহকারিতার যোগাযোগটা ঘটে, আমি এই কাজের জন্য প্রস্তুত ছিলাম, কারণ আমার দুটো সংগীতব্যবস্থাতেই ততদিনে প্রশিক্ষণ পাওয়া হয়ে গেছে। যেহেতু এই রেকর্ডিং-এর লক্ষ্য আমেরিকার শ্রোতা, আমি বারবার তাঁকে পাশ্চাত্যপ্রথায় স্বরলিপি ব্যবহার করে শেখানোর জন্যে অনুরোধ করছিলাম, ছাত্ররা যাতে স্রেফ তাঁকে নকল না করে ব্যাপারটা বুঝে আয়ত্ত করে, সেজন্য সেই দিকে শেখানোটাকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছিলাম। তিনি অশেষ ধৈর্য ও সমঝদারি নিয়ে সেসব শুনে সেইভাবে চেষ্টা করেছিলেন। আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত আমরা একটা মাঝামাঝি জায়গায় আসতে পেরেছিলাম।

একটা বাহারি বাক্সে ওই অনুষ্ঠানের রেকর্ডিংসহ তিনটে টেপ আর সঙ্গে চমৎকার অলংকরণসহ একটি সহকারী বই বার করা হয়। আমার কপিটার ওপর রবিশঙ্করজির মোটা পেনের সই করা আছে। এছাড়া আছে অনেকগুলি বাক্সে ভরা রাফ নোটের ছয়ের দশকের পুরোনো সেই কাগজগুলি, যার ওপরে আমরা ওই বক্তৃতামালার পরিকল্পনা ও সূচি তৈরি করেছিলাম।

লিজল্ বলত সেটা ছিল তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। আমারও।

প্রশ্ন : একটি বাংলাদেশি পরিবার আপনাদের তো খুব কাছের শুনেছি। তাঁদের কথা বলবেন?

ডানহ্যাম : বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র হিসেবে ছয়ের দশক থেকে একটি পরিবার আমাদের সবসময়ের সঙ্গী, মামাতো-মাসতুতো ভাই-বোনের মতো। এই পরিবারটিকে আমরা ন্যুইয়র্কে আসার ব্যাপারে সাহায্য করেছিলাম সেই ১৯৬৭ সালে, যখন এই রূপলাল দুরিয়া ঢাকায় আমার স্বামীর ড্রাইভার ছিল। এখানে আসার জন্য পাসপোর্ট, ভিসা করিয়ে এখানে আমার বাবার ড্রাইভার ও পরিচারক হিসেবে তাকে নিয়ে আসা হয়। ইতিমধ্যে ড্যান কলকাতায় গিয়েছেন ফোর্ড ফাউন্ডেশনের কাজ নিয়ে দু-বছরের জন্য। ফিরে এসে তিনি রূপলালকে খোদ পার্ক এভিন্যু-এর ওপর একটি বহুতল বাড়ির দারোয়ান হিসেবে কাজ খুঁজে দেন, সেখানেই সে ৩৫ বছর

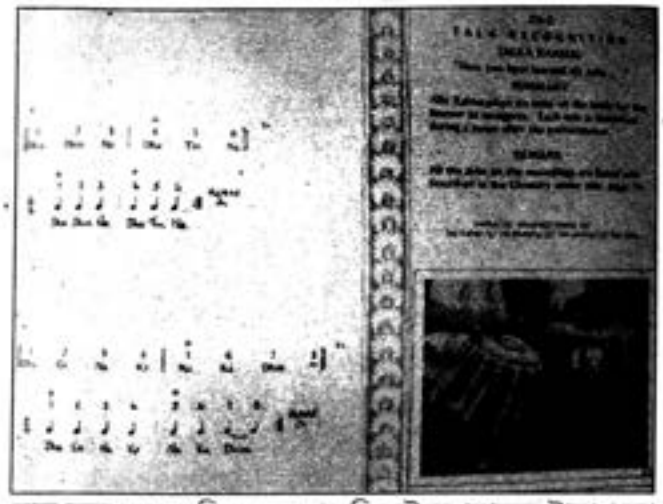

কাজ করে অবসর নিয়েছে। ড্যান নিজেই রূপলালের টাকাপয়সা এমনভাবে গুছিয়ে রাখত যাতে সে প্রতি দু-বছর অন্তর বাংলাদেশে যেতে পারে এবং নিশ্চিন্তে অবসরের পর স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে।

এরই মধ্যে উত্তাল হয়ে উঠল বাংলাদেশ। আমরা দেখলাম কীভাবে এই মেথর জাতের রূপলাল দুরিয়ার পরিবার—তার স্ত্রী মোনা আর তাদের চারটে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে সাম্প্রদায়িকতার শিকার হল পূর্ব-পাকিস্তানে। ১৯৭১-এর বসন্তে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় রূপলাল ন্যুইয়র্কে, কিন্তু তার বউ-বাচ্চারা ঢাকা থেকে তার শ্বশুরবাড়ি রাজশাহীতে চলে গিয়েছে। খানসেনারা তাদের ধরে ফেলে এবং পুরুষদের প্রায় সবাইকে মেরে ফেলে। সেইসময়ে রূপলালের বউ-বাচ্চাদের ন্যুইয়র্কে নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করি আমরা, রূপলাল নিশ্চিন্ত হয়।

ভাগ্যক্রমে রূপলাল আমাদের ন্যুইয়র্কের দামি পাড়ায় অবস্থিত বাড়ির খুব কাছে একটা সরকারি ভাড়া-নিয়ন্ত্রিত ফ্ল্যাট পেয়ে যায়। তাদের অভিজ্ঞতার একটা ডায়েরি রাখতাম তখন আমি। ঈস্ট নদীতে যে লুঙ্গি কাচতে পারবে না সেটা জেনে রূপলালের ভয়ানক হতাশার কথা লেখা আছে সেখানে। সুপারমার্কেটের ক্যাশিয়ারের সঙ্গে যে দরাদরি করা যায় না সেটা দেখে তার সে কী রাগ! স্বামী-স্ত্রী ইশকুলে পড়েনি, সম্পূর্ণ নিরক্ষর, তাই তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্ব ছিল আমাদেরই। তাদের ছোটো-ছেলেমেয়ে নিজেদের তীব্র মেধা, পরিশ্রম, চমৎকার ব্যবহার, আর সুন্দর চেহারার সম্মিলিত গুণে খুব নামকরা প্রাইভেট স্কুলে ভরতি হতে পেরেছিল। (এদেশে প্রাইভেট স্কুলে ভরতি করার সময় সব গুণেরই বিচার করা হয়)। এত সুন্দর চেহারা ছিল রূপলাল আর তার সাদা শাড়ি পরিহিতা স্ত্রী মোনার, যে ওই প্রাইভেট স্কুলের পিটিএ (শিক্ষক অভিভাবকদের নিয়মিত আলোচনাসভা) মিটিং-এ ওদের মাঝেমধ্যেই লোকজন প্রশ্ন করত, ওরা কোনো দেশের ডিপ্লোম্যাট কিনা! ছোটো মেয়েটি তো বড়ো হয়ে নামকরা মডেল হয়েছিল। বড়ো ছেলেমেয়ে দুটি সরকারি স্কুলেই পড়েছিল, খুব ভালো রেজাল্ট করেছিল। চার ছেলেমেয়েই পরে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পেরিয়ে চাকরি-বাকরি পেয়ে বিয়ে-থা করেছে, দুজনের ছেলেমেয়েও হয়েছে। রূপলাল আর মোনা এখনও নিরক্ষর, কিন্তু তারা চারটে ভাষায় কথা বলতে পারে—হিন্দি, বাংলা, উর্দু, আর এদেশে এসে রপ্ত হওয়া কথ্য ইংরেজি! রূপলাল নিজে আবার পরে তার ভাই, ভাইয়ের বউ, আর তাদের আটটি ছেলেমেয়েকে ন্যুয়র্কে নিয়ে এসে কুইনসে থাকার ব্যবস্থা

করে। আমার স্বামী তাদের এখানে আসা ও স্থিতু হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু আমাদের বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে থাকায় আমরা ওদের জন্য বেশি দেখাশোনা করতে পারিনি বলে কষ্ট হয়।

প্রশ্ন : এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে বাংলাদেশের প্রয়াত লেখক, ভাবুক ও মানবদরদী কর্মবীর আহমদ ছফার কথা, যাঁর সঙ্গে আমার মায়ের চট্টগ্রাম-তুতো ভাই-বোন আত্মীয়তার সুবাদে আমি তাঁকে ছফা মামা বলে ডাকতাম। ঘটনাচক্রে ছফা মামাও আপনার তো খুব চেনাজানা একজন মানুষ। তাঁর সম্পর্কে বলুন।

ডানহ্যাম : আমার *জারিগান* বইটা লেখার সময়ে লেনিন নামে একজন চমৎকার তরুণ ব্যক্তি আমাকে নানারকম বাস্তব সমস্যার সমাধান করার ব্যাপারে দারুণ সাহায্য করেন, বিশেষ করে বিশেষজ্ঞ, গায়ক, বয়াতি ও অন্যান্য যোগাযোগগুলি করে দেওয়ার ব্যাপারে। পরে আমার মেয়েকেও তার গবেষণায় সাহায্য করেন লেনিন। সমাজের নানা স্তরে বন্ধু বানানোর ব্যাপারে জুড়ি নেই লেনিনের, আহমদ ছফা তাদের একজন।

লেনিন কীভাবে আমাকে তোমার ছফা-মামার কাছে নিয়ে গেল সেই গল্পটা সামাজিক নেটওয়ার্কিং-এর এক আশ্চর্য উদাহরণ, লেনিনের দিক থেকে যতটা, ততটাই ছফার দিক থেকেও। ছফা সমাজের নানা স্তরে নিজেকে কীভাবে সংযুক্ত রাখতেন, কীভাবে সমাজের প্রায় যে-কোনো মানুষ তাঁর কাছে কোনো-না-কোনো ভাবে যাতে পৌঁছোতে পারেন সে-ব্যাপারে তিনি খুব যত্নের সঙ্গে নিজেকে ছড়িয়ে রাখতেন সমাজের নানা জালবিন্দুতে, প্রায় রূপকথার বই শার্লটস্ ওয়েবের সেই সুভদ্র মাকড়সাটির মতো, সেটা শেখার মতো বিষয়।

আমি যখন গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছি, তখন ছফা ঢাকার গ্যেটে ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুক্ত, তাছাড়া আরও একটি জার্মান বেসরকারি সংস্থা (এন জি-ও-)র সঙ্গে কাজ করছেন সমাজের নীচুতলার ছেলেমেয়েদের কম্প্যুটর শেখানোর জন্য। ঢাকার জার্মান কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে তিনি নয়ের দশকে একসময়ে জার্মানি যান, আর সেখানে জার্মান ভাষা শিখে গ্যেটের *ফাউস্ট* বইটার সরাসরি বাংলা অনুবাদ করেন। তাঁর নিজের লেখার জার্মান অনুবাদও সেখানে খুব সমাদৃত হয়। এছাড়া ছফা ভালো ফরাসি জানতেন, রোমাঁ্যা রোল্যাঁর খুব ভক্ত ছিলেন।

জার্মান সংস্থাটি ছফাকে প্রস্তাব দিলেন ছোটো ছেলেমেয়েদের জন্য একটি গান লিখে দেওয়ার জন্যে, যাদের ওই সংস্থা থেকে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের জন্য ফিলিপাইনস দেখতে পাঠানো হবে। গানের ধরন হিসেবে ছফা তখন জারিগান বেছে নিলেন। এইসময়ে লেনিন আবার গ্যেটে ইনস্টিটিউটের সঙ্গে পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গ সংগীতের নিয়মিত কনসার্ট আয়োজনের ব্যাপারে যুক্ত। আমার জ্যাজ-পিয়ানিস্ট জামাই সেখানে একটি সন্ধ্যায় পিয়ানো বাজিয়েছিল। লেনিনের সঙ্গে ছফার সেখানে আলাপ হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুয়ে দুয়ে চার করে আমার সঙ্গে ছফার পরিচয় করানোর কথা ভাবেন এই ভেবে যে ছফাকে আমার পছন্দ হবে।

আমার সিদ্ধেশ্বরী রোডের ফ্ল্যাটের খুব কাছেই ময়মনসিংহ রোডে একটি ছাদের ওপর ছফার বাসায় একদিন নিয়ে গেল লেনিন। এরপর সেখানে বহুবার অড্ডা দিতে গিয়েছি। লেনিন নিয়ে আসত পুলককে। পুলকের ভালো নাম সুকল্প, সে তরুণ গায়ক, জারিগানের প্রতিস্বরীকরণের ব্যাপারে সে আমার অ্যাসিস্টান্ট ছিল, পরে দিল্লিতে সংগীতে এম এ করতে যায়। ছফা যখন অতি নিবিষ্ট হয়ে তাঁর না অ্যাডভেঞ্চারের গল্প করতেন, তখন তারা দুজনে নিঃশব্দে খবরের কাগজের পাতায় মন দিত (গল্পগুলি তাদের বহুবার শোনা)! তাছাড়া ছফা মজা করে বলতেন যে সবসময়ে তাঁর পায়ের কাছে ভক্তরা বসে এমনভাবে তাঁর প্রতিটি শব্দ শুনতে থাকে যে নিজেকে তাঁর মাঝে মাঝে খুঁটে খাওয়া পাউরুটির মতো মনে হয়! তাঁর বই *পুষ্প, বৃক্ষ এবং বিহঙ্গ পুরাণ* উপন্যাসে হয়তো পড়েছ, ছাদের ওপর তাঁর বাগানটির বর্ণনা, আর ফুলন্ত গাছগুলির পারস্পরিক ঈর্ষার গল্প!

প্রায় প্রতিদিন আমরা দুজনকে সকাল সাতটা নাগাদ ফোন করতাম, আর ছফা ব্যস্ত না থাকলে আমার বাড়িতে তাঁর বাগানের দু-একটি গোলাপ নিয়ে চলে আসতেন। কখনও আবার আমিই চলে যেতাম তাঁর বাড়িতে সাইকেল করে। তাঁর আশ্রিত এক 'পাতানো ভাইপো' আমার সাইকেলটা চারতলা অব্দি বয়ে দিত, যাতে নীচে চুরি না হয়ে যায়! *পুষ্প বৃক্ষ এবং বিহঙ্গ পুরাণ*-এর পুনরানুবাদের দায়িত্ব নিতে আমি সানন্দে রাজি হই, তাঁর নিজের প্রাথমিক অনুবাদটি ঘষেমেজে দেওয়ার জন্য। এরপর রওনক জাহানের অনুবাদ করা ছফার ওম বইটির পুনরানুবাদেও আমি কাজ করি। দুটি উপন্যাসেই পাওয়া যায় মানুষের তুচ্ছ অহংবোধ সম্পর্কে আহমদ ছফার সকৌতুক দর্শন, আর-তার পাশাপাশি মানুষের স্বাভাবিক ভালোমানুষির ওপর তাঁর গভীর আস্থা।

১৯৯৬ সালে *জারিগান* বইটি লেখা শেষ করার পর ন্যুইয়র্কে ফিরে আসি এবং এই উপন্যাস দুটি অনুবাদের কাজ চালাতে চালাতে ছফার সঙ্গে নিয়মিত চিঠিপত্রে যোগাযোগ রাখি। ২০০১ সালে আমার স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ছফারও মৃত্যু ঘটে।

প্রশ্ন : তাহলে ফিরে আসি জারিগান বইটি প্রসঙ্গে।

ডানহ্যাম : ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ সালে ফের ঢাকায় ফিরে ফিল্ড ওয়ার্কের কাজ শুরু করি। এবারে আমার গ্রামে যাওয়া হয় বেশি, কাজের প্রয়োজনে। কয়েকজনের সাহায্য নিয়ে সুরের স্বরলিপি করার কাজে ফের হাত দিই। হাতে লেখা স্বরলিপিগুলি ন্যুইয়র্কে পাঠাতাম, আর আমার জামাই সেগুলি কম্প্যুটরে কম্পোজ করে প্রিন্ট করে দিত। সংগৃহীত জারিগানগুলি টেক্সট তৈরি করার জন্য সেইসময় অজস্র অনুবাদককে কাজে নিয়েছিলাম। স্থানীয় লোকভাষার বিপুল বৈচিত্র্যের কারণে অনুবাদ সবসময়েই খুব কঠিন লাগত।

আবার বলি, এইসময়ে 'বিষাদসিন্ধু'র একটা প্রোডাকশন দেখলাম যেটা আমাকে অভিভূত করে। ডক্টর জামিল আহমেদ এটা মঞ্চস্থ করেন, যিনি যাত্রাশিল্প নিয়ে চমৎকার বই লিখেছেন। নাটকটি ছয় ঘণ্টার ছিল, দু-রাত ধরে অভিনয় হয়। বহু বছর ধরে এই শো চলেছে।

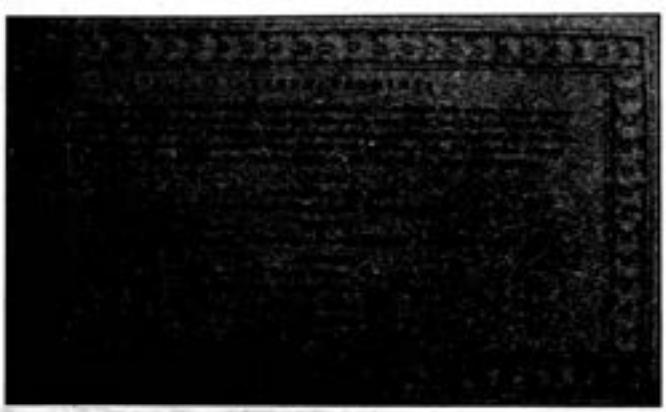

লোকসংগীত আর যাত্রার ট্রডিশনের মহৎ সমন্বয় ঘটেছিল। তার সঙ্গে মিশে ছিল তাজিয়ার ট্রাডিশন, আবার আধুনিক সব চিন্তাভাবনা। অত্যন্ত গভীরভাবে নাড়া দেওয়া নাটক, নান্দনিকভাবেও চূড়ান্ত সফল প্রযোজনা। আমার সঙ্গে গোটা দলটিরই দারুণ বন্ধুত্ব হয়ে যায়, আর ওই দুবছরে আমি নাটকটি ন-বার দেখেছি, গানগুলি রেকর্ড করেছি।

ঢাকার প্রতিবেশী বন্ধু আমেনে ইস্পাহানির মাধ্যমে ইরানের দূতাবাসের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হল। তাঁরা আমাকে একটি মহরম উৎসবে আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁদের কাছ থেকে শহীদগাথার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যের ছবির প্রতিকৃতি সংগ্রহ করি।

এইভাবে নানা সূত্র থেকে আমার সংগ্রহে রসদ জোগাড় করেছি।

প্রশ্ন : আপনার পরিবারেও তো তৈরি হয়ে গেছে বাংলার এক উত্তরাধিকার। আপনার কন্যা ক্যাথরিনের বাংলায় বড়ো হওয়া এবং ওর সাম্প্রতিক কাজ সম্পর্কে কিছু বলুন।

ডানহ্যাম : ১৯৬৪ সালে আমার মেয়ে ক্যাথরিনের জন্ম হয় ন্যুইয়র্কে। তার জন্মের তিন মাসের মধ্যেই আমরা ফের ঢাকায় আসি এবং এর ফলে সে বাংলায় কথাবার্তা বলেই বড়ো হয়। আমাদের ঢাকায় সেবার কাজ শেষ হওয়ার পর যখন ন্যুইয়র্কে ফিরে আসি তখন একটা মজার কাণ্ড হয়। এখানে স্কুলে ভরতি করার সময় ওর অতটা ইংরেজি সড়গড় হয়নি, বাংলাতেই কথা বলত বেশি, বিশেষ করে আমাদের পরিচারক বন্ধুদের সঙ্গে থেকে থেকে। ফলে আমেরিকার স্কুলে পাঠানোর সময়ে পাছে তার শিক্ষকরা না বুঝে ওর সম্পর্কে ভুল ধারণা করে ফেলেন, তাই আমি ওর গলায় একটা কার্ড ঝুলিয়ে দিতাম, যার ওপর ইংরেজিতে লেখা থাকত 'আমি ইংরেজি বেশি বলি না, বাংলা বলি'।

বড়ো হয়ে সে নিজেই ঢাকায় যাবে ঠিক করে, গার্মেন্টিস্ ফ্যাক্টরির মেয়ে-শ্রমিকদের নিয়ে গবেষণা করার জন্য। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত সেখানে থাকে, আমরাও সঙ্গে যাই। যদিও ও ছোটোবেলা থেকেই বাংলা জানে, এবং আমাদের ন্যুইয়র্কের সর্বক্ষণের বাঙালি সঙ্গী রূপলাল দুরিয়ার মেয়েদের সঙ্গে থাকতে থাকতে ভাষাটা ওর চর্চার মধ্যেই ছিল, তবু আমি সঙ্গে থাকতে সাক্ষাৎকারগুলির সময় ওর বেশ সুবিধে হয়েছিল।

আসলে ছয়ের দশকে ওর বাবা ড্যান ঢাকা ও কলকাতার যাযাবর শ্রমিকদের নিয়ে অনেকটা গবেষণার কাজ করেছিলেন, বিশেষ করে তাদের বসবাসের অবস্থার ওপর। ক্যাথরিন ওর বাবার কাজের ওপর ভিত্তি করে এগোতে পেরেছিল, বিশেষত মহিলাদের বসবাসদের বাড়তি সমস্যাগুলি নিয়ে। ঢাকা শহরে এই শ্রমিকসমাজটি পুরুষপ্রধান ও মুসলমানপ্রধান, মেয়েরা সাধারণত কিছুটা দূরে, গ্রামের দিকে থাকত, সেখান থেকে রোজ কাজে আসতে হত। এই বসবাসের সমস্যা নিয়ে একটি অভিনব সমাধান যুগিয়েছিল শেফালি নামের একটি ফেমিনিস্ট মেয়ে। সে একটি বাড়ির দুটো তলা ভাড়া নিয়ে সেখানে এই মহিলা-শ্রমিকদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। কেবল খাওয়া আর ঘুমের জায়গা নয়, তাদের অক্ষরজ্ঞান আর সহজ গণিত শেখানোর ব্যবস্থাও করেছিল শেফালি। তাদের ব্যাংকে টাকাপয়সা রাখা আর উপার্জনের অর্থ হিসেব করে খরচ করা নিয়েও শিক্ষা দেওয়া হত। নানা ফ্যাক্টরির মালিককে শেফালি এরকম ডর্মিটরি তৈরি করার ব্যাপারে তদ্‌বির করত।

সেই বছর ক্যাথরিন নোতরদাম কলেজের জন্য একটা বিশাল স্কুলবাড়ি ডিজাইন করেছিল। ড্যান ডিটেল কিছুটা দেখে দিয়েছিল। স্কুলবাড়িটি কয়েকবছর পর সমাপ্ত হয়।

ঢাকায় আমাদের সঙ্গী হয়ে আসার কয়েকদিনের মধ্যেই দেখি আমার জ্যাজসংগীতবাদক জামাই আমাদের তৈরি করা ২০০টি বাংলা শব্দের কার্ড মুখস্থ করে ফেলছে! ঢাকায় আসা বিদেশিদের জন্য এই কার্ডগুলি আমরা তৈরি করেছিলাম সেই ছয়ের দশকে, নাম দিয়েছিলাম 'ভালো' কার্ড। সে আবার তবলাও শিখল অনেকের কাছে, অল্প সময়ের মধ্যেই দেখি খুব পরিশ্রম করে প্রধান বোলতালগুলি রপ্ত করে ফেলেছে।

সেবছর আমরা সবাই মিলে একটা চারতলা বাড়ির চতুর্থ তলায় দুটো ঘর নিয়ে থাকতাম, আর সামনেই ছিল একটা প্রকাণ্ড ছাদ। ছাদের ওপর ক্যাথরিন একটা কাজকরবার আর খাওয়াদাওয়া করবার চমৎকার ছাউনিঘেরা কুটির ডিজাইন করে দিল। ছাদের বাকি অংশটা জুড়ে আমরা একটা টবে ভরা বাগান করে ফেললাম। একজন রিকশা-আর্টিস্ট আমাদের এই পল্লিজীবনের একটি চমৎকার ছবি এঁকেছিল, এখনও সেটা আমার কাছে আছে।

এই ছবিটিই আমার বাংলাদেশের ছবি। আমার বাংলার ছবি।

জানুয়ারি ২০০৮ বইমেলায় প্রকাশিত হচ্ছে

যাটের স্বতন্ত্র কবি বাসুদেব দেব-এর সাম্প্রতিকতম কবিতার বই

আরো কিছু কথা

আমাদের আবহমান জীবনের খণ্ড মিছিল, অস্তিত্বের সামান্য অনুবাদ

দাম : চল্লিশ টাকা

৯/৩ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

কবিসম্মেলন

কবির কাগজ কবিতার কাগজ • প্রতিমাসে একবার
চতুর্থ বর্ষ • পঞ্চম সংখ্যা • জানুয়ারি ২০০৮

■

কবিকাহিনি

গৌতম গুহরায় ১৫

সবিনয় নিবেদন ৩
পাঠকমন ৫
বিষয় : কবিতা অংশুমান কর ১৯
সেই সময় তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭
পড়ে পাওয়া ৫৩-৫৮
মৃণাল বসু চৌধুরী
রাণা চট্টোপাধ্যায়
শংকর চক্রবর্তী
অজিত বাইরী
কবিতার কাগজ প্রমথেশ চক্রবর্তী ৬০
কবিতা সংবাদ ৬১

কবির বিদায়

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ১৩

সাক্ষাৎকার

সৌম্য দাশগুপ্ত ৩৭

কবিতা ৩২-৩৬
সুব্রত রুদ্র কৃষ্ণা বসু নয়ন রায় বারীন ঘোষাল প্রশান্ত গুহ মজুমদার
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় সৌমিত্র সেনগুপ্ত উৎপল ঝা অর্ণব রায়
চৈতালী চট্টোপাধ্যায় অমৃতেন্দু মণ্ডল রতন জানা
নীলিমা সাহা নুরুল আমিন বিশ্বাস
সুজিত হালদার

দূরের কবিতা

অংকুর সাহা ৪৭

■

সম্পাদক : শ্যামলকান্তি দাশ

সম্পাদকমণ্ডলী: গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, শংকর চক্রবর্তী, তমালিকা পণ্ডাশেঠ, অপূর্ব দত্ত, আবদুস শুকুর খান

শিল্পনির্দেশক : তরুণকান্তি বারিক **প্রকাশক**: গুণেন শীল **প্রচ্ছদ** সুব্রত মাজী

বর্ণ সংস্থাপন ভাষাশিল্প, ৯/৩ টেমার লেন, কলকাতা৭০০ ০০৯ **মুদ্রক** মিনতি প্রিন্টার্স, ১২ টেমার লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯
দপ্তর : পত্রলেখা, ৯/৩ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ দূরভাষ: ৯৮৩১১১০৯৬৩, ২৫৭৮ ০৫২১
দাম ১০ টাকা
Website : kabisammelan.kaurab.com
E-mail : kabisammelan_patralekha@yahoo.co.in

কবির কাগজ কবিতার কাগজ • জানুয়ারি ২০০৮ • ১০ টাকা

কবিসম্মেলন